OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 457 - 463
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 457 - 463
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

লোককথায় নারীর অবস্থান : ‘ঠাকুরমার ঝুলি’-র আলোকে বিশ্লেষণ

মুনিয়া সরকার
প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: munia.sarker@seu.edu.bd

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Thakurmar Jhuli, Folktales, Female Characters, Patriarchy, Gender Perceptions, Stereotypes, Folklore, Cultural Construction.

Abstract
Thakurmar Jhuli (1907), compiled by Dakshinaranjan Mitra Majumdar (1877–1956), is a timeless work of Bengali literature and an invaluable repository of traditional Bengali folktales. The representation of female characters in this collection offers profound insights into the social and cultural realities of Bengali folk society. Within these stories, women are portrayed both as embodiments of affection, sacrifice, and moral virtue and as figures associated with power, jealousy, and fear. In most narratives, the influence of a patriarchal social structure is evident, where male characters occupy positions of authority while female characters are often confined to supportive or subordinate roles. Nevertheless, in several tales, women demonstrate intelligence, wisdom, and strategic agency in overcoming challenges, revealing their inherent strength and capability. Characters such as stepmothers and ogresses reflect prevailing negative stereotypes and fear-based perceptions of women within society. In contrast, figures such as princesses and mothers represent socially constructed ideals of femininity. Thus, the female characters in Thakurmar Jhuli are not merely components of the narrative; they serve as subtle reflections of the values, gender perceptions, and cultural mentality of the folk community. This study reveals that women in the text- whether as mothers, princesses, stepmothers, or ogresses- are presented in diverse and multidimensional forms, carrying a wide range of symbolic meanings within the realm of folk imagination. Therefore, the primary objective of this research is to analyze the social and cultural position of female characters in Thakurmar Jhuli.

Discussion

লোকসাহিত্য একটি জাতির সামাজিক ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানসিকতার প্রতিফলন। বাংলা লোকসাহিত্যের ধারায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের (১৮৭৭-১৯৫৬) *ঠাকুরমা'র ঝুলি* (১৯০৭) একটি অনন্য সংকলন, যেখানে কল্পনা ও বাস্তবতার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 457 - 463
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংমিশ্রণে রচিত রূপকথা ও লোককাহিনি সমাজের নানাবিধ মূল্যবোধকে উপস্থাপন করে। এই সংকলনের নারীচরিত্রসমূহ কেবল গল্পের অংশ নয় বরং তারা সমাজে নারীর অবস্থান, ভূমিকা ও পরিচয়ের সাংস্কৃতিক নির্মাণকে প্রকাশ করে। নারী চরিত্রগুলোতে তৎকালীন গ্রামীণ ও সমাজজীবনের গভীর ছাপ রয়েছে। এই চরিত্রগুলো মূলত দুই ভাগে বিভক্ত - মানবিক চরিত্র (রাজকন্যা, রানী, দুঃখী মা, সৎ মা) এবং অতিপ্রাকৃতিক বা পৌরাণিক চরিত্র (রাক্ষসী, পেত্নী, পরী)। বাঙালি গ্রামীণ নারীর চিরায়ত রূপ, আত্মত্যাগ, সন্তান বাৎসল্য ও স্নেহময়ী রূপ ফুটে উঠেছে সুয়োরানি, দুখিনী মা বা রাজমাতার মতো চরিত্রগুলোতে। মা ও রাজকন্যা চরিত্র সাধারণত ত্যাগ, সৌন্দর্য, সহনশীলতা ও নৈতিকতার প্রতীক। এই চরিত্রগুলো 'আদর্শ নারীত্ব' নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার সৎ মায়ের নিষ্ঠুরতা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। তৎকালীন সমাজে বহুপত্নীকতার ফলে সৃষ্ট পারিবারিক ঈর্ষা, ষড়যন্ত্র ও দ্বন্দ্বের প্রতীকী প্রকাশ ঘটেছে সৎমা চরিত্রগুলোতে (যেমন-দুয়োরানি)। সৎমা ও রাক্ষসী চরিত্রসমূহ ঈর্ষা, প্রতিহিংসা ও ধ্বংসাত্মক আচরণের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত। এটি সমাজে নারীর ক্ষমতাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা নির্দেশ করে। রাক্ষসী বা খোক্কসী চরিত্রগুলোতে সাধারণত অশুভ শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। এরা প্রবল পরাক্রমশালী ও কুটিল হলেও, শেষপর্যন্ত রাজপুত্রের বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়। আবার অনেক গল্পে নারী চরিত্রই মূল চালিকাশক্তি, শক্তি ও সাহসের প্রতীক। এ ধরনের গল্পে নারী চরিত্র কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে। তারা সরাসরি ক্ষমতার কেন্দ্রে না থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করে। যেমন - 'সাত ভাই চম্পা'র পারুল বা 'কিরণমালা' অদম্য সাহসের পরিচয় দেয়। রূপকথায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের পরীর উপস্থিতি রয়েছে, যারা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ঐশ্বরিক শক্তির জোগান দেয়। গল্পসমূহে পুরুষ চরিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। নারী চরিত্রকে সহায়ক বা নিয়ন্ত্রিত অবস্থানে রাখা হয় যা পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন। বলা যায়, *ঠাকুরমার ঝুলি* পুরুষপৃথিবীর গল্প। পুরুষপৃথিবীর গল্প হলেও 'কলাবতী রাজকন্যা', 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা', 'সাত ভাই চম্পা', 'কিরণমালা', 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' প্রভৃতি গল্পে মূলত নারী অভিজ্ঞতার নিপুণ প্রকাশ ঘটেছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *ঠাকুরমা'র ঝুলি*র প্রায় সবগুলো গল্পই নারীপ্রধান গল্প - তবু নারীরাই সমস্ত নিগ্রহ ও নির্যাতনের শিকার। বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয় যে, অধিকাংশ রূপকথায় সকল অপকর্মের মূলে আছে ডাইনি স্বভাবা কোনো নারী এবং তাদের অপকর্মের সহজ শিকারও হচ্ছে নারীরা। রূপকথাগুলোতে মূলত নারী দাঁড়িয়েছে নারীর বিরুদ্ধে, তার দেখা সর্বত্রই পুরুষ এসেছে অসহায় নারীকে উদ্ধার করতে।[১] অর্থাৎ এখানে নারীচরিত্রের বহুমাত্রিক রূপ যেমন - আদর্শ, নেতিবাচক ও কৌশলী রূপ দেখা যায়। নারীর ক্ষমতা প্রায়শই পরোক্ষভাবে সামাজিক স্টেরিওটাইপ নারীর চরিত্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নারীর এই বহুমাত্রিক চরিত্রায়নের মাধ্যমে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কেবল গল্পই বলেননি বরং চিরায়ত বাঙালি সমাজের ভালো-মন্দের দোলাচল ও নারীদের যাপিত জীবনের খণ্ডচিত্রও অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

'ঠাকুরমা'র ঝুলি'-র প্রথম গল্প 'কলাবতী রাজকন্যা'। এ গল্পে কলাবতী রাজকন্যা ছিলেন স্বাধীন জগতের নারী। এ গল্পে রূপার বৈঠা, হীরার হালের শুকপঙ্খী নাও ভাসিয়ে রাজকন্যা একা বেরিয়েছেন দেশ-বিদেশ ঘুরতে, সঙ্গী তার সোনার শুক। এখানেই স্বাধীনতার ইঙ্গিত। আবার বুদ্ধুর প্রশ্ন, "রাজকন্যা, এখন তুমি কার?" এর উত্তরে রাজকন্যার বয়ানেও বোঝা যায়, "আগে ছিলাম বাপের মায়ের, তা'র পরে ছিলাম আমার; এখন তোমার।" এই "তা'র পরে ছিলাম আমার" পর্বে রাজকন্যা স্বাধীন। স্বাধীন রাজকন্যা বুদ্ধুকে বিয়ে করে নিজের রাজ্যপাট ছেড়ে বুদ্ধুর বাঁদী হয়ে চললেন বুদ্ধুর রাজ্যে।

আবার এ গল্পে আছে রাজার সাতরাণী, কারোরই ছেলেপুলে নেই। গোটা পৃথিবীতেই রূপকথার ধারাবাহিক সমস্যা সন্তানহীনতা। সন্ন্যাসী একটি শিকড় দিলেন, বেটে সাত রাণীকে খেতে। সাধভক্ষণের মন্ত্রের মতো, ছেলেভুলোনো ছড়ার মতো এখানেও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পুত্রসন্তান চাই, এটি লক্ষ্য করে আমরা গল্পে ঢুকে পড়ি। পাঁচ রাণী মিলে শিকড়টি বেটে ভাগাভাগি করে খেয়ে নিলেন। ন রাণী একটু তলানি পেলেন, ছোটোরাণী কিছুই না। তাঁরা জল তুলছিলেন, মাছ কুটছিলেন। অকুস্থলে হাজির ছিলেন না। ছোটোরাণী যখন কেঁদে ভাসাচ্ছেন তখন ন রাণী বললেন, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 457 - 463
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "ওমা! ওর জন্য কি তোরা কিছুই রাখিস নাই? কেমন লো তোরা! চল বোন ছোটরাণী, শিল-নোড়াতে যদি একাধটুকু লাগিয়া থাকে, তাই তোকে ধুইয়া খাওয়াই। ঈশ্বর করেন তো উহাতেই তোর সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।"[২]

বাকি পাঁচ রাণীর মানুষ ছেলে জন্ম নিল আর অভাগিনী দুজন! শিল ধোয়া জল খেয়ে ছোটোরাণীর হল বানরপুত্র আর ন রাণীর পেঁচাপুত্র - এরাই বুদ্ধু আর ভূতুম। গল্পের শুরু চরম ঈর্ষা আর দলাদলি দিয়ে। গল্পের শেষে বহু রোমাঞ্চকর অভিযানের শেষে বিজয়ী বুদ্ধুভূতুম দুই রাজকন্যাকে বিয়ে করে রাজার দুপাশে বসল। তাদের দুখিনী মায়েরা রাজরাণী হলেন আর পাঁচ রাণী ঘরে গিয়ে খিল দিলেন। পাঁচ রাজপুত্র ঘরে গিয়া কবাট দিলেন। পাঁচ রাণী আর খিল খুলল না। পাঁচ রাজপুত্রেরা আর কবাট খুলল না। রাজা পাঁচ রাণীর আর পাঁচ রাজপুত্রের ঘরের উপরে কাঁটা, মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিল। এরপর প্রকৃত রাজপুত্রদের ছদ্মবেশ ঘোচানো, বানরের ছাল আর পেঁচার পাখ পোড়ানো শুধু সময়ের অপেক্ষা। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত পাঁচ রাণী ও পাঁচ রাজপুত্র যৎপরোনাস্তি দুষ্ট প্রকৃতির কোনো সন্দেহ নেই। তারা শুধু ঈর্ষা করেনি, বুদ্ধু-ভূতুমকে মেরে ফেলতে অনেক চেষ্টা করেছে। তবু বাবা হয়ে রাজামশাই আপন ছেলেদের ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেললেন, ব্যাপারটা কেমন যেন লাগে! পিতৃস্নেহ ও ক্রোধের মধ্যে দ্বিতীয়টিই জিতছে এমন দৃষ্টান্ত নেই তা নয়। মোগল, পাঠান বা তুরস্কের অটোমানদের ইতিহাসে পিতা কর্তৃক পুত্রনিধন বা পুত্রের অন্ধত্ব সম্পাদনের ইতিবৃত্ত আছে। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-তে এই রাজাই কিন্তু বানর আর পেঁচা প্রসবের পর দুই রাণীকে চিড়িয়াখানার বাঁদী ও ঘুঁটেকুড়ানী দাসী করেছিলেন। বুদ্ধু আর ভূতুম রাজসভায় এসে রাজার কাঁধে বসেছিল। তাদের গালে চুমো খেয়ে বুকে তুলে নিলেও রাণীরা যখন ভূতুমের গালে ঠোনা আর বুদ্ধুর গালে চড় মারল রাজা আর কথা বলতে পারেননি, চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

গল্পের পিতৃতান্ত্রিক বয়ান খুব স্পষ্ট। রাজার কোনো দোষ নেই, থাকতে পারে না। মোটামুটি বেশিরভাগ মেয়েরা নষ্টের মূল। 'শীত বসন্ত' গল্পে যেমন শয়তানের প্রতিমূর্তি হল সুয়োরাণী - সে রাক্ষসী নয় বটে কিন্তু রাক্ষসীর থেকে তার হিংস্রতা এক তিলও কম নয়। সতীন কাঁটা উদ্ধারের জন্য, বহুপত্নীক স্বামীর মন পাবার জন্য ঈর্ষাকাতর মেয়েরা অভিচার প্রক্রিয়ার সাহায্য নেয় প্রাচীনকাল থেকে। এমনকি ঋগ্বেদেও সেই প্রসঙ্গ আছে। মাথার চুলে ক্ষার খৈল দিতে গিয়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর মাথায় ওষুধের বড়ি টিপে তাকে পাখি করে উড়িয়ে দেয়। সুয়োর তিন ছেলে। সতীনের ছেলে দুইটা যে নাদুসনুদুস - আর তাঁর তিন ছেলে পাটকাটি। হিংসায় রাণীর মুখে অন্ন রুচেনা, রাতে ঘুম হয় না। অবশেষে একদিন কী দাবি করল সে, -

> "শীত বসন্তের রক্ত নহিলে আমি নাইব না!" অমনি রাজা জল্লাদকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, - "শীত বসন্তকে কাটিয়া রাণীকে রক্ত আনিয়া দেও।"[৩]

এখানেও রাজার কোনো ঔচিত্যবোধের পরিচয় নেই। যে রাজার নিজের ছেলেদের সঙ্গে এমন ব্যবহার তার রাজ্যে প্রজারা কেমন থাকে কে জানে! রূপকথার, পুরাণের পশুপাখি, জল্লাদেরা হৃদয়বান হয়। শিশু ঈডিপাসকে বাঁচিয়েছিল রাখালরা। শকুন্তলার গল্পে পাখিরা সারারাত শিশুটিকে ঢেকে রাখে। রোমিউলাস ও রেমাসকে নিজের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়েছিল একটি নেকড়ে। এ গল্পে জল্লাদ শীতবসন্তকে ছেড়ে দিয়ে দুটো শিয়ালকুকুর কেটে রক্ত এনে রাণীকে দিল –

> "রাণী সেই রক্ত দিয়া স্নান করিলেন; খিলখিল করিয়া হাসিয়া আপনার তিন ছেলে কোলে পাঁচ পাত সাজাইয়া, খাইতে বসিলেন।"[৪]

এই বর্ণনার বীভৎসতার তুলনা হয় না। অবিকল একই রকম প্রায় স্নো-হোয়াইট অ্যান্ড সেভেন ডোয়ার্ফের গল্প। আসলে সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস সৎমা স্নেহময়ী হতেই পারে না। লোকচৈতন্যে সৎমা সম্বন্ধে অবিশ্বাস, দ্বিধা, সংশয়, ঘৃণা দানা বেঁধে থাকে, রূপকথাতেও তার নানা ধরনের প্রকাশ ঘটেছে। এইসব গল্প মনের মধ্যে গেঁথে বড়ো হবার পর সমাজ সংসারে সৎমা ও সৎ ছেলেমেয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক আশা করাটা অস্বাভাবিক।

এ কাহিনিতে একজন রূপবতী রাজকন্যা আছেন, যিনি শুধুই সাজগোজ করেন। সাজগোজ করেন এবং টিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সোনার টিয়া, বল তো আমার আর কি চাই?' সাজগোজের জন্য সোনার টিয়ার পরামর্শে স্বয়ম্বর সভায়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 457 - 463
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বায়না ধরেন গজমোতির হারের। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রূপকথাগুলোতে অ-রাক্ষসী রাজকন্যাদের চরিত্র অত্যন্ত অপরিণত, আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো হাস্যকর। কিছুতেই যেন ব্যক্তি হয়ে ওঠেন না।

নারীর হিংসা-কপটতা-হিংস্রতার বলি আরেক নারী। যেন নারীর দুর্ভাগ্যের অন্য কোনো কারণ থাকেনি কখনো। ‘কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা’ গল্পে অসহায়, করুণা উদ্রেককারী চরিত্র কাঞ্চনমালা। নিজের গুণে নয়, সুঁচ-রাজার রাখাল বন্ধুর কৌশল ও প্রচেষ্টায় কাঞ্চনমালা উদ্ধার পান। কাঞ্চনমালাই যে প্রকৃত রানী তা কিন্তু আবার প্রমাণিত হয়। রানীর পিঠা বানানোর এবং আল্পনা দেবার নৈপুণ্য দেখে অর্থাৎ গৃহকর্মে তিনি কতখানি নিপুণ, তার সাপেক্ষে। রাজার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণে এত ঝামেলা, তিনি উদ্ধার পেলেও কাঁকনমালাকে মরে যেতে হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত করার উপায় রাখা হয় না।

‘সাত ভাই চম্পা’ গল্পে যথারীতি রাজার সাত রানী। রানীদের মর্যাদা নির্ণীত হয় পুত্রসন্তান জন্ম দেয়ার কৃতিত্বের উপর। ছোট রানীর ছেলে হবে শুনে বড় রানীরা হিংসায় জ্বলে মরতে লাগল। বড় রানীদের চক্রান্তে সাতপুত্র-এক কন্যা জন্মদানকারী ছোটরানী ‘ব্যাঙের ছানা ইঁদুরের ছানা’ জন্ম দেয়ার অপরাধে রাজার এত প্রিয় ছোটরানী রাজপুরী থেকে নির্বাসিত হলেন। পুত্র জন্ম না দিতে পারার শাস্তি। শান্ত ছোটরানী ভালবাসার পাত্রী, পুত্র জন্ম দিতে অক্ষম ছোটরানী বিতাড়িত।[৫] সৎমার নিষ্ঠুরতা নিয়ে গ্রিমভাইদের সংকলনে একটি সাংঘাতিক গল্প আছে, গল্পটির নাম কোথাও ‘দি আমন্ড ট্রি’ কোথাও ‘দি জুনিপার ট্রি’। সৎমা সেখানে সৎছেলেকে সিন্দুকের ভারি ডালা মাথায় ফেলে খুন করে মাংস রান্না করে বাবাকে খাইয়েছে। সৎমার কোমলচিত্ত বালিকা কন্যা দাদার হাড়গোড় উঠোনের বাদামগাছতলায় রাখে - ঐ গাছ থেকে তখন অপূর্ব সুন্দর এক পাখির জন্ম হয়। ঐ বাদামগাছের কাছেই ছেলেটির মা পুত্র প্রার্থনা করেছিল, তাই বাদামগাছটি হয়ে উঠছে মায়ের প্রতিরূপ- ভালো মা। আর খারাপ মা অর্থাৎ সৎমার মাথায় জাঁতার পাথর ফেলে তাকে মেরে ফেলে পাখিটি বাবা আর বোনের কাছে স্বরূপে আবার ফিরে আসে সুখের সংসারে।

ঠাকুরমা’র ঝুলি-র ‘কিরণমালা’র গল্পে হিংসুটি রাণীদের জায়গা নিয়েছে রাণীর নিজের দুই দিদি। মেয়েদের হিংসার কাছে রক্তসম্পর্কও যেন কিছু না। রাতের বেলা ঘরের বাইরে কান পেতে রাজা তিন বোনের বিয়ের ইচ্ছের গল্প শুনেছেন। একজন রাজবাড়ির ঘেসেড়া, অন্যজন রাজবাড়ির রাঁধুনির বৌ হতে চায়। ছোটোবোনের উচ্চাশা বেশি- সে রাণী হতে চায়। রাজা দিলদরিয়াভাবে সকলের ইচ্ছাই পূরণ করেন। পরে ছোটোবোনের সুখ ঐশ্বর্য দেখে দুই দিদি চক্রান্ত করে। রাণী তিনবার সন্তানসম্ভবা হলে তারা তিনবারই আসে আঁতুড় তুলতে। পরপর তিনবার ছেলেমেয়ে তিনটিকে মুখে নুনতুলো দিয়ে কাঁচামাটির ভাঁড়ে করে ভাসিয়ে দেয় আর রাজাকে দেখায় কুকুরের ছানা, বিড়ালের ছানা আর কাঠের পুতুল। রাজ্যের লোক বলাবলি করে রাণী অলক্ষণা, পেত্নী কিংবা ডাকিনী। রাজা রাণীকে ঘরের বার করে দিলেন, হিংসুটে বোনরা আহ্লাদে আটখানা -

> “রাজ্যের লোকেরা ডাকিনী রাণীকে উল্টাগাধায় উঠাইয়া, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া রাজ্যের বাহির করিয়া দিল।”[৬]

শিউরে ওঠার মতো বর্ণনা। এখানে সমাজে অদ্যাবধি বলবৎ পিতৃতান্ত্রিক ধারণাটির অনুবর্তন দেখছি। সন্তানের জন্মগত খুঁত, রোগবালাই, বিকলাঙ্গতা, কুশ্রীতা - সবই মায়ের গর্ভের দোষ। যেন মা একাই সৃষ্টি করেছে ভ্রূণটিকে।

‘কিরণমালা’ একমাত্র ব্যতিক্রমী গল্প যেখানে রাজকন্যা কিরণমালাই মূল এবং সক্রিয় চরিত্র। তবুও কাহিনিতে নারীর বিরুদ্ধে নারী। মায়া পাহাড়, অর্থাৎ অন্য একটি নারী প্রধান রাজ্যের পতন ঘটালেন রাজকন্যা কিরণমালা। আর মায়ার পাহাড় - আজও নারী ছলনাময়ী, রহস্যময়ী, মায়ায় ঘেরা - এসব তো অতি সাধারণভাবে, সবসময়ে উচ্চারিত কথাগুলোর একটি। অরুণ-বরুণ-কিরণের কল্যাণে নির্বাসিত রানী মিলিত হতে পেরেছেন স্বামী-পুত্রের সঙ্গে এবং ফিরে আসতে পেরেছেন রাজপুরীতে। ‘পাতাল-কন্যা মণিমালা’ বাংলা রূপকথার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি নারী চরিত্র। রাজকন্যা মণিমালার সঙ্গে অন্যান্য রূপকথার রাজকন্যাদের পার্থক্য এই যে, সে জলের তলায় পাতাল প্রদেশে এক সাপের অধীনে বন্দিনী হয়ে বাস করত। সাপের মাথার মণির সাহায্যে পাতালের পথ চিনে রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র সেখানে উপস্থিত হয় এবং রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পৃথিবী দেখার লোভের কারণে সে জলের বাইরে আসে এবং নিজের বিপদ ডেকে আনে। অবশেষে মন্ত্রীপুত্রের বুদ্ধিকৌশলে রাজপুত্র ও মণিমালার আবার মিলন হয়। ‘ডালিম কুমার’ গল্পটিতে পাশাবতী এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 457 - 463
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তার ছয় বোন বুড়ি নয়; সুন্দরী তরুণী। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত কোনো পুরুষের গলায় মালা দেয়নি। তারা স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করছে। যে সব নারী নিজ গুণে এবং জ্ঞানে অনেক ক্ষমতার অধিকারী কিংবা শাসন করেছেন নিজের ক্ষমতা বলয় তাদের অগ্রাহ্য করা চলে না।

আপাতদৃষ্টে এক কিরণমালা ব্যতীত বন্দিনী রাজকন্যারা রাজপুত্রদের অসীম গুণাবলি, অপরিমেয় তেজ এবং অশেষ স্বপ্ন বাস্তবায়নের এবং তা প্রকাশের উপলক্ষ মাত্র। রানীরা চক্রান্তকারী অথবা চক্রান্তের শিকার-অসহায় অস্তিত্ব। এরা গৃহের নারী। বাকি রইল যেসব নারী, তারা রাক্ষসী। হয় রাক্ষসী-পুরীতে তাদের রাজত্ব, যেখানে রাজকন্যারা বন্দি অথবা ছদ্মবেশে মানুষের রাজপুরীতে রানী হিসেবে তাদের অধিষ্ঠান। রাজপুত্র, রাজা, রাজ্যের মানুষ, পশু-পাখি খেয়ে ধ্বংস করাই যাদের উদ্দেশ্য। এসব চক্রান্তকারী রানী এবং রাক্ষসীদের স্বরূপ উন্মোচন করে অসহায় রানী এবং বন্দি ও ঘুমন্ত রাজকন্যাদের মুক্ত করার যাবতীয় নায়কোচিত কাজের বিবরণতো *ঠাকুরমার ঝুলি*র বিষয়বস্তু। যেসব নারী চরিত্র সক্রিয়, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই অশুভ শক্তির প্রতীক। বাকিরা সহানুভূতি কাড়ে, সম্ভ্রম জাগায় না।[৭] যদিও রাজকন্যা কিরণমালা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এবং সক্রিয় চরিত্র, তবুও পরবর্তীতে দেখা যায় কিরণমালার সক্রিয়তা আসলে সামগ্রিক পুরুষ পরিমন্ডলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠারই হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

রূপকথা যে মুখ্যত শিশুদের জন্য, তারা তো মেয়েদের কোলেকাঁখেই বড় হয়। গল্পগুলি দক্ষিণারঞ্জন এবং আরো অনেকের মতে মেয়েদেরই রচিত। এই সমস্যার সমাধান অবশ্য খুব কঠিন নয়। পিতৃতন্ত্রের ছাঁচে মন যখন গড়ে ওঠে পুরুষ ও নারীর ধ্যানধারণায় তফাৎ খুব বেশি থাকে না। পিতৃতন্ত্র যেভাবে ভাবতে শেখায় সাধারণত ভাবনা সেই পথে চলে। 'পঞ্চতন্ত্র'র নারীঘৃণাও কিছুটা বিস্ময়কর। কারণ বিষ্ণুশর্মা অপরিণতবয়স্ক বালকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। বিদেশি সাহিত্যেও ব্যাপারটা একই রকম। Adolf Bastian-এর *Elementary Ideas* নামে বইটি একটু মনে রাখছি।

দেখা যাচ্ছে, নারী সম্পর্কে একটি দ্বিমুখী ভাবনার স্রোত কাজ করে। রূপকথা বা লোককথার কেন্দ্রে থাকে হিরো বা বীর নায়ক - সে তার পক্ষীরাজে চড়ে, ব্যঙ্গমা বা অন্য বাহনের সাহায্যে, কখনো ময়ূরপঙ্খী নৌকা বেয়ে অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র- নানা বাধা পার হয়ে অচেনা অজানা দেশে যায় রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। ঘুমন্ত রাজকন্যা সোনার কাঠি, রূপার কাঠির স্পর্শে জেগে ওঠে। এটি খুব প্রিয় ও পরিচিত মোটিফ। বিদেশি রূপকথাতে রাজকন্যা জেগে ওঠে নায়কের চুম্বনে। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-তে 'ঘুমন্ত পুরী', 'পাতাল-কন্যা মণিমালা', 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' - সব গল্পেই এই ঘুমন্ত সুন্দরী সুকুমারী কন্যার ছবি আছে। 'ব্রায়ার রোজ'ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সে যেন সমস্ত কামনার প্রস্ফুটিত আশ্রয়। আবার রাক্ষসী, মায়াবিনী, কুহকিনী - তারা নায়ককে ফাঁদে ফেলে গ্রাস করতে চায়। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিম কুমার', 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি'- এই সব গল্পে রাক্ষসীর সঙ্গে লড়াইয়ের গল্প জমে উঠেছে। 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' গল্পে রাজপুত্র রাক্ষসীর কবল থেকে বাঁচতে এক দয়ালু আমগাছের মধ্যে আশ্রয় নেয়। আমগাছটি কিছুতেই রাক্ষসীর কথায় রাজপুত্রকে বার করে দিতে রাজি হয় না, রাক্ষসী তখন অন্য পথ নেয় –

"তখন রাক্ষসী এক রূপসী মূর্তি ধরিয়া সেই গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।"[৮]

দেশের রাজা শিকার করতে এসে গাছতলায় পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখে রাজপুরীতে নিয়ে গিয়ে রাণী করলেন। একদিকে নারীর সৌন্দর্য, স্নেহ, সতীত্ব যেন স্বর্গীয় বলয় সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে সেই নারীর মধ্যেই মায়াবিনী, ধ্বংসকারিণীকে দেখা হচ্ছে। নারী সম্পর্কে আতঙ্ক ও আকর্ষণের এই মিশ্র অনুভূতির চিত্রকল্প *চণ্ডীমঙ্গলের* 'কমলে কামিনী'র মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রে সহস্রদল পদ্মের উপর বসে এক পরমাসুন্দরী কন্যা একটি হাতি গিলছে আবার উগরে দিচ্ছে।

নারীই জীবন, আবার সে মৃত্যু, তাকে জয় করার মধ্যে বীরনায়ক জীবনকে অধিগত করে বিজয়নিশান ওড়ায়। কিন্তু এই ভাবনার মধ্যেই সংগুপ্ত আছে নারীকে ভয়ংকরী রূপে কল্পনা করার বীজ। রক্তমাংসের ক্রন্দন, বাসনার উদ্দামতা, জৈবকোষের অদম্য ইচ্ছাশক্তি, আগ্রাসনস্পৃহা - এইসব কিছুর উগ্র প্রকাশের প্রতি এক ধরনের ঘৃণা থাকে মানুষের। অস্তিত্বের এই সব প্রমত্ত শক্তিকে সে কোমল সুরভিত প্রসাধিত মৃদুতায় ভূষিত করতে চায়। তাই যখন কোনো বিচ্যুতি ঘটে, আরেকজন কাউকে মানুষ চায় - যার ওপর এই স্খলনের দোষ চাপানো যাবে। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারী হয়ে ওঠে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 457 - 463
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই দোষের আধার। নারীই যেন মূর্তিমতি পাপ, সে জৈবতার স্থূল হাতছানি, সে সত্তার পরাজয় স্বরূপা। এইভাবে দেখে নিজে আশ্বস্ত হয় মানুষ। এই কুহকিনীকে পরাস্ত করাই চূড়ান্ত বীরত্ব।

ঠাকুরমা'র ঝুলি-র 'ডালিমকুমার' গল্পে দুটি ভয়ংকরী নারীশক্তির দেখা যায়। প্রথমজন রাক্ষসী- সে রাণীকে খেয়ে রাণী সেজে আছে। রাজপুত্র ডালিমকুমার দেখেছে 'খাবার দিবার সময়, মায়ের জিভের একফোঁটা জল টস্ করিয়া পড়িল। গা ছমছম!' রাক্ষসীরাণীর সাত ছেলে হল। তারা কিন্তু মানুষ। রাক্ষসীর আজ্ঞাবহ সূতাশঙ্খ, আরেক দানব, সে এক রাজ্যে গিয়ে রাজকন্যার পেটে আশ্রয় নিয়েছে। রোজ রাজকন্যার বিয়ে হয়, রোজ পেট থেকে সূতাশঙ্খ বিকট অজগর হয়ে বেরিয়ে রাজকন্যার বরকে খেয়ে ফেলে। রাক্ষসীর ষড়যন্ত্রে অন্ধ ডালিমকুমার সূতাশঙ্খকে তরোয়াল চালিয়ে হত্যা করে। দ্বিতীয় কুহকিনীর দল হল পাশাবতীরা সাতবোন। কড়ির পাহাড়, হাড়ের পাহাড় পার হয়ে তাদের দেশ। পাশা খেলতে বসে তাদের পণ হল -

"যে জিতে সে মালা পায়,
হারিলে মোদের পেটে যায়!"[৯]

রাজপুত্রেরা পাশা খেলতে এসে হেরে যায় আর পাশাবতীরা তাদের কুচিকুচি করে খেয়ে রূপসী মূর্তি ধরে বসে থাকে। ডালিমকুমার এই পাশাবতীদের কৌশলে পরাস্ত করে মৃত্যুমুখে পাঠায়, ভাইদের উদ্ধার করে। রাক্ষসী তখন রাণীর শরীর ছেড়ে পালায় আর মরেও যায়। আশ্চর্য ব্যাপার রাক্ষসীর সাত ছেলেও একবার মায়ের কথা বলে না। আগের রাণী রাজা ও আট ছেলেকে নিয়ে সোনার হাট সাজায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে গল্পগুলিতে রাক্ষসী মা সন্তানকে খেয়ে ফেলে, জীবিত সন্তানরাও দুষ্টপ্রকৃতির মার কথা মুখে আনে না।

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী সুলামিথ ফায়ারস্টোনকে এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কারণ লিঙ্গীয় স্তরায়নই নারীর শ্রেণি ও সমাজ-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে –

> "Gender inequality originated in the patriarchal societal structures imposed upon women through their biology; the physical, social and psychological disadvantages imposed by pregnancy, childbirth, and subsequent child-rearing..."[১০]

সমাজ নারীর জৈবিক ভূমিকার কারণে তাকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল বা অধস্তন অবস্থানে রেখেছে। গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনের দায়িত্বকে কেন্দ্র করে নারীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। আর এই প্রক্রিয়াই লিঙ্গবৈষম্যকে টিকিয়ে রেখেছে। যা হোক, *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-তে এমনটাই ঘটেছে। এর ব্যত্যয় ঘটেনি। যেমন- 'সাত ভাই চম্পা'য় বড়রানীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করতে সাত-রাজপুত্র পারুল মেয়ের ভূমিকা সমানই ছিল, তবুও গল্পটির নাম কিন্তু 'সাত ভাই চম্পা'। তাছাড়া 'কলাবতী রাজকন্যা', 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা', 'সাত ভাই চম্পা', 'কিরণমালা', 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' প্রভৃতি গল্পে সব শৌখিন উচ্চতার 'রমণী'। চিরায়ত বা আবহমান ঐতিহ্যে - তারা এক কৃষ্টিতে গড়া। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র প্রায় সব গল্পই নারীপ্রধান। নারীর অসহায়ত্ব যেমন এতে ফুটে ওঠে, তেমনি রূপময় ঐতিহ্যেরও তাতে প্রকাশ ঘটে। তবে পুরুষ তাতে একপ্রকার কর্তৃত্বপ্রবণ, বলশালী এবং আধিপত্যবাদী। সেখানে নারীরাও তা মান্য জ্ঞান করেছে। পুরুষ অসহায় নারীকে উদ্ধার করতে এসেছে। পুরুষ কখনো শোষক। আবার পুরুষের চোখেই নারীর অভিজ্ঞতাও সমাজে বিচার্য বিবেচিত হয়েছে। সেভাবেই তারা সমাজে বা গল্পে প্রতিষ্ঠিত। ফলে তাদের লিঙ্গীয় মর্যাদাও ওই মাপেই পুনর্গঠিত। ফায়ারস্টোনের তত্ত্বও তাই বলে।

ঠাকুরমা'র ঝুলি-র নারীচরিত্রসমূহ লোকসমাজের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, লিঙ্গ-ধারণা ও মানসিক কাঠামোর প্রতিফলন। এখানে নারী একদিকে আদর্শায়িত, অন্যদিকে ভয় ও সন্দেহের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত। তবুও তাদের বুদ্ধি ও কৌশলগত ভূমিকা নারীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে নির্দেশ করে। ফলে এই সংকলন নারীচরিত্রের একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সামাজিক নির্মাণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

Reference:

১. ঘোষ, ড. বিশ্বজিৎ, *দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও তাঁর 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' শতবর্ষের মূল্যায়ন*, অবসর, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৩

২. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, বিভাস, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩১

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৫. ঘোষ, ড. বিশ্বজিৎ, *দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও তাঁর 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' শতবর্ষের মূল্যায়ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫ ও ১৮৬

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

৭. ঘোষ, ড. বিশ্বজিৎ, *দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও তাঁর 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' শতবর্ষের মূল্যায়ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

৮. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

১০. Shulamith Firestone, *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*, New York: Morrow, 1970, P. 11-12